স্বামীজির মা ও বাবা

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বই লেখার কাজে আমি কিছু মানুষজনের বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে রয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারের সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী সর্বভূতানন্দ। তাঁর আপনাত্ব, সাহচর্য ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা না পেলে আমার এ কাজ পূর্ণত্ব লাভ করত না। পেত না তার যথাযথ সম্মান। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

তার পর যিনি আমায় এ কাজকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দস্ এ্যানসেসটারল হাউস এ্যান্ড কালচারাল সেন্টারের সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী জিতাত্মানন্দ। তিনিই আমায় স্বামীজির নতুন বাড়ির সমস্ত ছবি দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া যোগোদ্যান, কাশীপুর উদ্যানবাটি ও বরানগর মঠের ছবি সংগ্রহের কাজেও আমি নানাভাবে সেখানকার মহারাজদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি।

সবার ওপর যাঁদের উৎসাহ আমায় এ কাজকে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছে তাঁরা হলেন গৃহী-সন্ন্যাসী নির্বিশেষে এক বিশাল স্বামীজি ভক্তের গোষ্ঠী। তাঁরা এই দিব্য পুরুষের জ্যোতির উৎসকে জানতে চেয়েছেন। জানতে চেয়েছেন ভুবনেশ্বরীদেবী ও বিশ্বনাথ দত্তকে।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE

GOL PARK KOLKATA-700 029 INDIA

Phone : (91-33-)2464-1303(3 LINES); 2465-2531(2 LINES); 2466-1235(3 LINES); *Gram* : INSTITUTE CALCUTTA
Fax : (91-33-) 2464-1307; *E.Mail* : rmic@vsnl.com; *Website* : www.sriramakrishna.org

'শেষ নাই যে, শেষ কথা কে বলবে' - এই উক্তি যাথার্থ কতোটা প্রযোজ্য স্বামী বিবেকানন্দসম্বন্ধে - তা এখন বোধগম্য হচ্ছে। মাত্র উনচল্লিশ বছরের সীমারেখায় আবদ্ধ এই মহৎ জীবনের আবিষ্কৃত অংশ আমাদের পরিচিত, কিন্তু আজও কতটা অনাবিষ্কৃত তার হিসেবনিকেশ কে করে ? দিনে দিনে তিনি নবনবরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন গবেষকদের প্রচেষ্টায়। কয়েকবছর আগে স্বামীজীর দুটি অপূর্ব ফোটো আমাদের গোচরে এসেছে, ভারত-আত্মার সন্ধানে পরিব্রাজক স্বামীজীর ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অবস্থানের কতো অজানা তথ্য এখন প্রকাশিত হচ্ছে। অজানা স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তাকে জানার চেষ্টা অব্যাহত, কিন্তু তাঁর মা-বাবাকে জানার, তাঁদের সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের প্রচেষ্টা খুবই অল্প। স্বামীজীর মা ভুবনেশ্বরী দেবীর একটিমাত্র ফোটোই এতদিন পর্যন্ত আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর আরো একটি ফোট উদ্ধার হয়েছে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে। জীবনে কতো আঘাত, অভাব-অনটন, শোকতাপ সহ্য করেছেন এই সর্বংসহা জননী। তারই প্রকাশ এই নবাবিষ্কৃত চিত্রে। ভুবনেশ্বরী দেবীর তবু দুটো ফোটো পাওয়া গেল। কিন্তু স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কোন ফোটো আজও পাওয়া যায় নি। বিশ্বনাথ দত্ত তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত এক ব্যক্তিত্ব, অন্যান্য প্রদেশের জনচিত্তে তাঁর অস্তিত্ব উজ্জ্বল ছিল। এমন সামাজিক মানুষটির ছবি অবশ্যই তোলা হয়েছিল, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে, নানা বিপর্যয়ে সেইসব ছবি কি আমরা চিরকালের জন্য হারিয়েছি? এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

স্বামীজীর পিতামাতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি পরিমিত। এবিষয়ে আগ্রহী সকলের প্রথম ও প্রধান আশ্রয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা। এর পরে মহেন্দ্রনাথ দত্তের অমূল্য স্মৃতিচারণা ও আরো কয়েকজনের স্মৃতিকথায় যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়। সেইসব ছড়ানো তথ্যগুলি একত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করার মহৎ প্রয়াস আছে ডঃ চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান গ্রন্থে। লেখিকার নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের পরিচয় তথ্যঅনুসন্ধান ও পরিবেশনায়। যথাযথ সুষ্ঠু পরিবেশনার অভাবে তথ্যসম্ভার নীরস হয়ে পড়ে, পাঠক ক্লান্তিবোধ করেন। ডঃ শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল প্রথম শ্রেণীর জোগাড়ে বা রাঁধুনি নন, তিনি পরিবেশনেও সুনিপুণা। এককথায় তিনি গ্রন্থরচনায় সুগৃহিনী।

পরিবেশিত সকল তথ্য আমাদের অজানা না হলেও, বেশ-কিছু তথ্য পাঠকদের কাছে নতুন লাগবে, এটি আমার বিশ্বাস। লেখিকা আক্ষেপ করেছেন যে, স্বামীজীর জীবনীতে কেবল স্বামীজীর পিতৃবংশই আলোচিত হয়েছে, স্বামীজীর মাতৃবংশ উপেক্ষিত রয়ে গেছে। ত্যাগশীল ভক্ত মাতৃবংশের প্রভাব স্বামীজীর জীবনে কম ছিল না। এ তত্ত্ব লেখিকা যুক্তি ও তথ্যসহযোগে প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখিকা এই বইটিকে সঠিক গবেষণাগ্রন্থ করতে চান নি, তবু কিছু কিছু তথ্যের উৎস-উল্লেখ থাকলে পাঠকদের জ্ঞানতৃষ্ণা ও কৌতূহল প্রশমিত হতো। সমকালীন পত্রপত্রিকায় (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ) প্রকাশিত ভুবনেশ্বরী দেবীর তিরোধানের সংবাদ ও শোকপ্রকাশ পরিবেশিত হলে পাঠকবর্গ ঐ দৃপ্তা মহীয়সী জননীর পরিচয় আরও নিবিড়ভাবে পেতেন।

কথায় ছবি আঁকার দক্ষতায় লেখিকা অতুলনীয়া। সুলিখিত গ্রন্থটি পাঠকালে পাঠক আবেগতাড়িত হয়ে উঠবেন এবং সেকালের আলো-বাতাস-গন্ধ অনুভব করবেন, আমাদের এটি দৃঢ় ধারণা।

গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ 'স্বামীজীর মাতৃভাবনা' শীর্ষক অধ্যায়টি। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর উল্লেখ স্বামীজীর বাংলা পত্রাবলীতে ১২ বার এবং ইংরেজী পত্রে ১৮ বার সর্বসাকুল্যে ৩০ বার পাওয়া যায়। এছাড়া স্বামীজীর সম্পূর্ণ রচনাবলীতে ৮ বার মায়ের কথা আছে। 'মাতৃভাবনা' আলোচনায় লেখিকা কেবল শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও ভুবনেশ্বরী কথা বলেই ক্ষান্ত হন নি, আলোচনার গন্ডি অনেক বড় করেছেন, এটা বিস্ময়ের বিষয়। সর্বশেষে, ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিংকে লেখা স্বামীজীর দুটি মর্মস্পর্শী পত্রের আনুবাদ দিয়ে গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

'হৃদয় প্রসারিত করে স্বামীজীর চিরদুঃখিনী মাতা ও পিতার উপাখ্যানকে যিনি গ্রহণ করবেন, তিনিই উপভোগ করতে পারবেন এই গ্রন্থকে।' হৃদয়বান পাঠকরা অবশ্যই এই গ্রন্থটিকে সাদরে গ্রহণ করবেন এবং ডঃ চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রম, প্রচেষ্টা ও তথ্য অনুসন্ধান সার্থকতার মর্যাদায় ভূষিত হবে। আমি গ্রন্থটির ও শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর নিত্য আশীর্বাদে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সিক্ত হোক।

সর্বভূতানন্দ

স্বামী সর্বভূতানন্দ
সম্পাদক

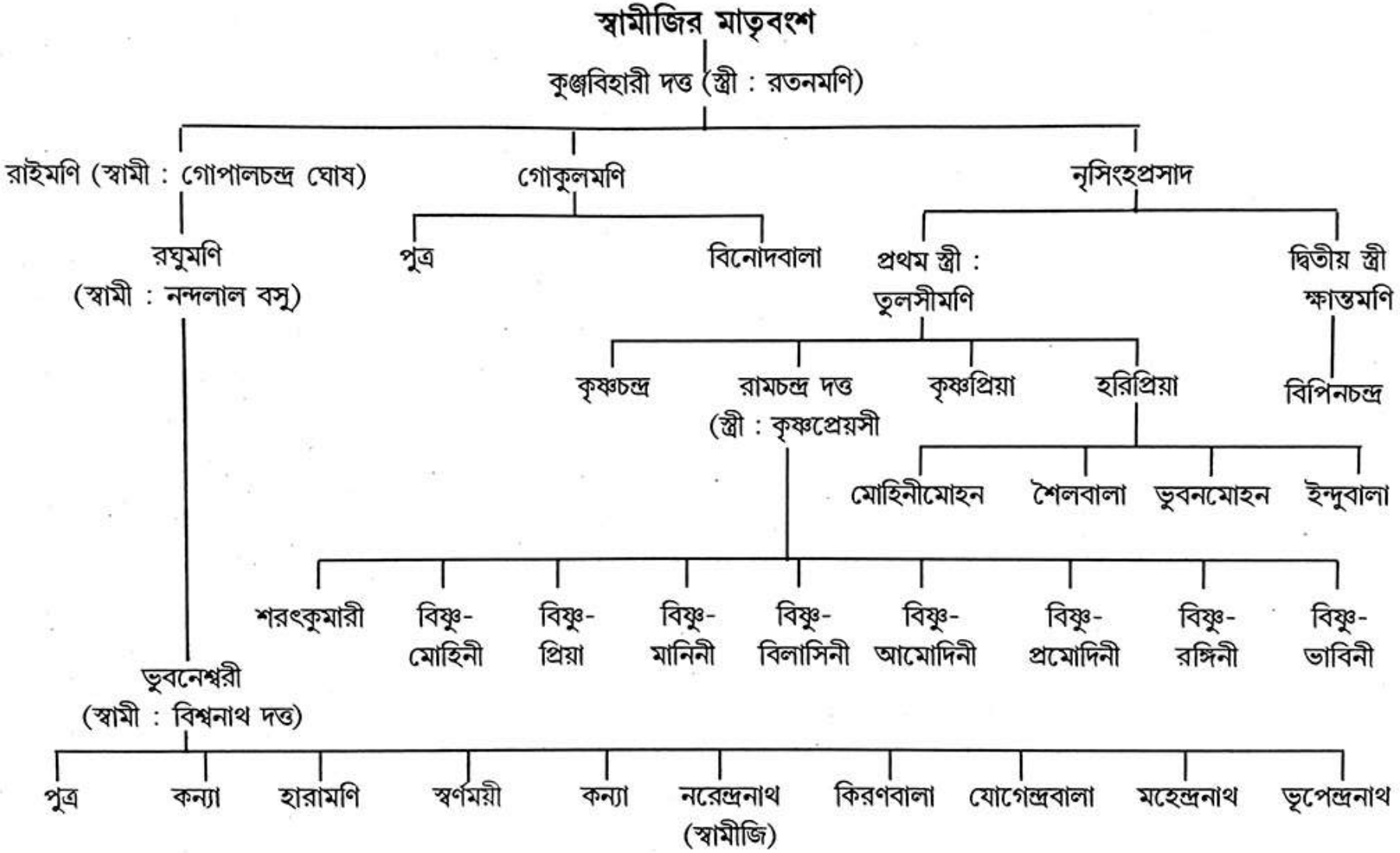

স্বামীজির মাতৃবংশ

কুঞ্জবিহারী দত্ত (স্ত্রী : রতনমণি)
রাইমণি (স্বামী : গোপালচন্দ্র ঘোষ)
গোকুলমণি
নৃসিংহপ্রসাদ
রঘুমণি
(স্বামী : নন্দলাল বসু)
পুত্র
বিনোদবালা
প্রথম স্ত্রী :
তুলসীমণি
দ্বিতীয় স্ত্রী :
ক্ষান্তমণি
কৃষ্ণচন্দ্র
রামচন্দ্র দত্ত
(স্ত্রী : কৃষ্ণপ্রেয়সী
কৃষ্ণপ্রিয়া
হরিপ্রিয়া
বিপিনচন্দ্র
মোহিনীমোহন
শৈলবালা
ভুবনমোহন
ইন্দুবালা
শরৎকুমারী
বিষ্ণু-
মোহিনী
বিষ্ণু-
প্রিয়া
বিষ্ণু-
মানিনী
বিষ্ণু-
বিলাসিনী
বিষ্ণু-
আমোদিনী
বিষ্ণু-
প্রমোদিনী
বিষ্ণু-
রঙ্গিনী
বিষ্ণু-
ভাবিনী
ভুবনেশ্বরী
(স্বামী : বিশ্বনাথ দত্ত)
পুত্র
কন্যা
হারামণি
স্বর্ণময়ী
কন্যা
নরেন্দ্রনাথ
(স্বামীজি)
কিরণবালা
যোগেন্দ্রবালা
মহেন্দ্রনাথ
ভূপেন্দ্রনাথ

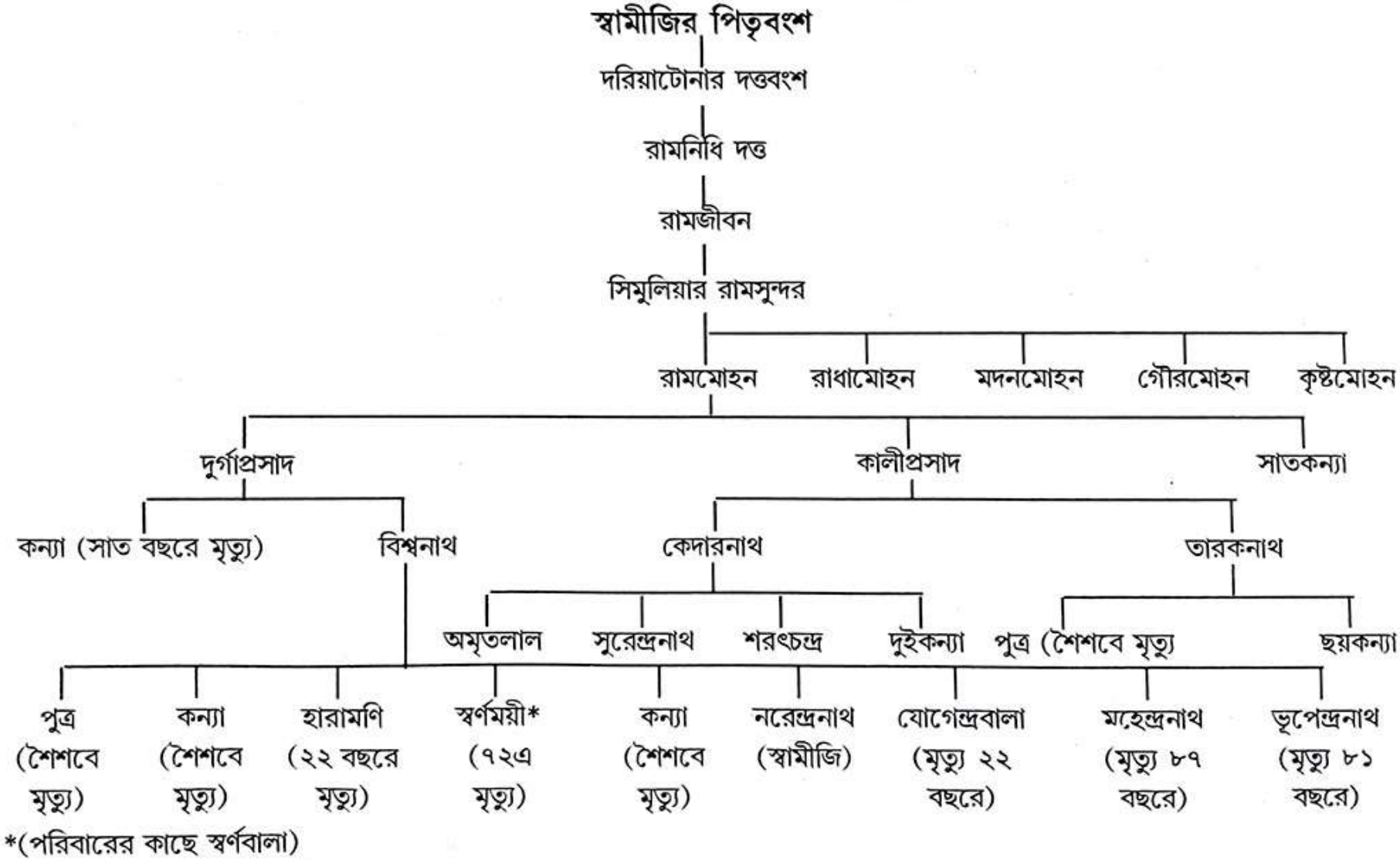
স্বামীজির পিতৃবংশ
দরিয়াটোনার দত্তবংশ
রামনিধি দত্ত
রামজীবন
সিমুলিয়ার রামসুন্দর
রামমোহন
রাধামোহন
মদনমোহন
গৌরমোহন
কৃষ্টমোহন
দুর্গাপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ
সাতকন্যা
কন্যা (সাত বছরে মৃত্যু)
বিশ্বনাথ
কেদারনাথ
তারকনাথ
অমৃতলাল
সুরেন্দ্রনাথ
শরৎচন্দ্র
দুইকন্যা
পুত্র (শৈশবে মৃত্যু
ছয়কন্যা
পুত্র (শৈশবে মৃত্যু)
কন্যা (শৈশবে মৃত্যু)
হারামণি (২২ বছরে মৃত্যু)
স্বর্ণময়ী* (৭২এ মৃত্যু)
কন্যা (শৈশবে মৃত্যু)
নরেন্দ্রনাথ (স্বামীজি)
যোগেন্দ্রবালা (মৃত্যু ২২ বছরে)
মহেন্দ্রনাথ (মৃত্যু ৮৭ বছরে)
ভূপেন্দ্রনাথ (মৃত্যু ৮১ বছরে)
*(পরিবারের কাছে স্বর্ণবালা)

সূচিপত্র

আমার কথা	.....	২৯
সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়	.....	৩৪
ভুবনেশ্বরীদেবী	.....	৫০
বিশ্বনাথ দত্ত	.....	৯০
স্বামীজির মাতৃভাবনা	.....	১১৬

আমার কথা

কেমন করে এই বই লেখার কথা আমার মনে এল সেও এক অদ্ভুত ঘটনা। টেলিভিশনে দেখলাম যে স্বামীজির নতুন বাড়ির উদ্‌ঘাটন হল। তারই পাশে মিশনের এক নতুন লাইব্রেরি খোলার কথাও জেনেছিলাম। আমার পড়াশোনার কাজে ভালোই বইয়ের প্রয়োজন হয়। এদিকে বইয়ের সর্বদা আকাল। ঔৎসুক্য আগ্রহের সম্মিলিত টানে একদিন চলে গেলাম ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের নব নির্মিত প্রাসাদের দিকে।

প্রাসাদের সিংহদুয়ার পেরিয়ে টিকিট কেটে অভিভুতের মতো ঘরদুয়ার, উঠোন-আঙিনা, পুজোদালান, বৈঠকখানা একের পর এক পেরিয়ে যেতে লাগলাম। রোমাঞ্চিত শরীর মনকে শুধু একটাই ভাবনা আচ্ছন্ন করে রাখল— বিলে ও তার মা ভুবনেশ্বরী দেবী। আন্তর্জাতিক কায়দায় তৈরি স্বামীজির নতুন বাড়ির আনাচেকানাচে তাঁর বৈচিত্র্যময় ছেলেবেলার তৈলচিত্র আর অডিয়ো ভিশুয়াল শো। অভাবনীয় পরিবেশ যেন টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেই দেড়শো বছর আগেকার দিনগুলোতে। দেয়ালের চলচ্চিত্রে বারবার প্রতিফলিত হচ্ছিল ভুবনেশ্বরীদেবীর ছবি। তাঁর দুঃখক্লিষ্ট মুখাবয়বের মধ্যে তাঁর গভীর দুঃখি দুটি পদ্মপাপড়ির মতো চোখ — অবিকল স্বামীজির মতো, আমার মরমে গেঁথে গেল একেবারে। বাড়ি ফিরে এলাম, কিন্তু সেই অব্যক্ত বেদনায় ভরা মর্মভেদী দৃষ্টির স্মৃতি আমার মন থেকে গেল না।

অনেকেই বলল স্বামীজির মাকে নিয়ে কিছু লেখার চিন্তা করাই বৃথা, তাঁর মায়ের ব্যাপারে বিশেষ কোনো তথ্য নেই। কিন্তু এই কথায় আমার উৎসাহ দমল না। লাইব্রেরি যেতাম নিজের পড়ার কাজে, সেই ফাঁকে স্বামীজির বাল্যজীবনের বই খুঁজে খুঁজে পড়তে আরম্ভ করলাম। মহামনীষীর জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যত তাঁর মাকে জানতে আরম্ভ করলাম তত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আকর্ষণ বাড়তে লাগল। তাঁর জীবনের অল্প কিছু ঘটনা সংগ্রহ করে একটি আলেখ্য লিখলাম। 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হল। লেখাটা বেরলে আমি এইটুকু বুঝতে পারলাম যে স্বামীজি-ভক্ত সকলেই তাঁর মা-র ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী। সবাই তাঁর কথা ভীষণভাবে জানতে চায়। ইতিমধ্যে আর একটা লেখা পাঠালাম তাঁর মা-বাবা

উভয়কে নিয়ে, ইংরেজিতে — চেন্নাই থেকে প্রকাশিত 'বেদান্ত কেশরী'তে। দশদিনের মাথায় সে লেখা মনোনীত হল। শ্রীঘ্রই এই লেখা প্রকাশিত হবে সম্পাদক মহারাজ নিজে যেচে সে কথা বললেন।* আমার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল— একাগ্রচিত্তে আমি বহু গ্রন্থ ঘেঁটে এই বইয়ের কাজে মনোনিবেশ করলাম।

কাজ করতে আরম্ভ করে বুঝলাম যে সত্যিই স্বামীজির মা-বাবাকে নিয়ে বিশেষ তথ্য নেই। নেই তাঁদের কোনো সঠিক জীবনী। যদিও স্বামীজির মা ভুবনেশ্বরীদেবীর জীবনরেখা ছিল যথেষ্ট লম্বা। স্বামীজির মৃত্যুর পর দীর্ঘ নয় বছর তিনি জীবিত ছিলেন। তবু তাঁর কোনো জীবন-লিপি সংগ্রহ করে রাখা হয়নি। আজ থেকে বহু বছর আগে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বন্ধু ও স্বামীজির প্রখ্যাত জীবনীকার শৈলেন্দ্রনাথ ধর তার 'দা কমপ্রিহেনসিভ বায়োগ্রাফি অফ স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে 'এটি প্রকৃতই দুঃখের ব্যাপার যে আজও ভুবনেশ্বরীদেবীর একটি ছোট্ট জীবন-লিপিও প্রকাশিত হয়নি আর আমরা তাঁর বিষয়ে এত অল্প জানি'। এস. এন. ধরের এই উক্তির এত বছর পরেও পরিস্থিতির কোনো রদবদল হয়নি। ভুবনেশ্বরীদেবীর দীর্ঘ দুঃখি জীবনের আখ্যায়িকা খাপছাড়া ভাবে ছড়ানো রয়েছে। সেই একই পরিস্থিতি স্বামীজির বাবা বিশ্বনাথ দত্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁদের জীবনের টুকরো ঘটনাগুলোকে আমি যথাসাধ্য সংগ্রহ করে নিজের মতো করে সাজিয়েছি। তাই এই বইকে ভুবনেশ্বরীদেবী ও বিশ্বনাথ দত্তের জীবনী না বলে জীবন ক্ষণিকা বলা যেতে পারে।

স্বামীজির মা ও বাবা, দুজনেই বিশেষ গুণে গুণী। তাঁদের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের প্রখর ছাপ রয়েছে স্বামীজির চরিত্রে। মায়ের প্রভাব তো সবচেয়ে বেশি, সে কথা তিনি সারাজীবন দেশে-বিদেশে বহুবার জানিয়েছেন। জানিয়েছেন তাঁর বন্ধুমহলে, ভক্তবৃন্দের মাঝে, বক্তৃতায় ও আলোচনাসভায়। মায়ের চিরতপস্বিনী মূর্তি যে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের পথে প্রেরণা জুগিয়েছে সে কথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তাঁর বৈচিত্র্যময় অদ্ভুত শৈশবের প্রতিটা শিক্ষার হাতেখড়ি তাঁর মা ভুবনেশ্বরীদেবীর হাতে। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছেও তিনি বহু শিক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল দুর্দমনীয়। ছেলেবেলায় খেলার প্রাঙ্গণে সর্বদা রাজা হওয়ায় আগ্রহী নরেন্দ্র পরে

---

* 'বেদান্ত কেশরী' নভেম্বর, ২০০৭ সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও সর্বদা তাঁর দুঃখি জননীর জন্য উদবিগ্ন হয়ে পড়তেন। সন্ন্যাসের কঠোর নিগ্রহকে ছিন্ন করে বারেবারে চলে আসতেন তাঁর গর্ভধারিণীর কাছে। এমনকী শেষ জীবনটা তাঁর কাছে থেকেই কাটাতে চেয়েছিলেন। কে এই অসাধারণ রমণী, যিনি স্বামীজির মতো সূর্যপুরুষকে এভাবে আকর্ষণ করতেন! আকর্ষণ করতেন তাঁর বহু বিদেশি শিষ্য-শিষ্যাদের, যাঁরা তাঁকে একবার মাত্র দেখবার আশায় ছুটে যেতেন তাঁর উত্তর কলকাতার সংকীর্ণ বাসগৃহে। কী তাঁর প্রতিকৃতি! সেই অনন্যসাধারণ জননী ভুবনেশ্বরীদেবী ও পিতৃরত্ন জ্ঞানী বিশ্বনাথ দত্তকে সকলের সামনে তুলে ধরার আগ্রহেই আমার এই জীবন ক্ষণিকা লেখার প্রয়াস।

গত একশো বছরে স্বামীজির বহু ভক্ত ও অনুরাগী নানাভাবে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চিত্রণ করেছেন। সেইসব জীবনী পড়তে পড়তে আমার বারবার মনে হয়েছে যে তাঁরা প্রায় সকলেই শুধু স্বামীজির পিতৃবংশের কথাই আলোচনা করেছেন। মাতৃবংশের কথা হয়তো কোথাও কোথাও উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু আলোচিত হয়নি। অথচ স্বামীজির মাতৃবংশ জ্ঞান, কুলশীল, পদমর্যাদা ও বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চেতনায় ছিলেন খুবই উচ্চস্তরের। ভুবনেশ্বরীদেবীর প্রমাতামহীর বাবা কুঞ্জবিহারী দত্ত ছিলেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মদনমোহনজিউ মন্দিরের তখনকার মালিক, প্রতিপত্তিশালী গোকুলচাঁদ মিত্রের বিরাট এস্টেটের ম্যানেজার। এই ম্যানেজারকে গোকুলচাঁদ আপন পুত্রের মতো স্নেহ করতেন ও মৃত্যুকালে নিজের বিরাট সম্পত্তি কুঞ্জবিহারী দত্ত ও আপন ছেলেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কুঞ্জবিহারী সেই বিপুল ধন স্পর্শ করেননি, সমস্ত দান করে দেন তাঁর একান্ত আরাধ্য মদনমোহনজিউর সেবায়। এই কৃষ্ণভক্ত কুঞ্জবিহারীর নাতনি ছিলেন স্বামীজির প্রিয় দিদিমা রঘুমণিদেবী, আর এই ত্যাগশীলা ভক্ত বংশের রক্ত ছিল স্বামীজির পূতচরিত মাতা ভুবনেশ্বরীদেবীর ধমনিতে।

শুধু তাই নয়, ভুবনেশ্বরীদেবীর জ্যাঠতুতো ভাই (যিনি ছিলেন স্বামীজির বড়োমামা) কৈলাশচন্দ্র বসু ছিলেন যেমন প্রগাঢ় জ্ঞানী তেমনি বাক্‌পটু ও বক্তা। তাঁর তীব্র বুদ্ধি ও সম্মোহনী বাচন ক্ষমতা যে কোনো সভাসমিতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারত। তখন ছিল ইংরেজ রাজত্ব আর তিনি ছিলেন মনে প্রাণে সংগ্রামী ভাবধারায় আপ্লুত।

স্বামীজির আধ্যাত্মিক সচেতনতার বেশিটাই ছিল তাঁর মাতৃবংশ সূত্রে প্রাপ্ত। আরো অন্যান্য বহুগুণের মধ্যে তাঁর অকুণ্ঠিত দেশভক্তি ও ক্ষুরধার বক্তৃতার

সম্মোহনী ক্ষমতাও তিনি মাতৃবংশ থেকেই পেয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেই একই ভাবধারাকে সমর্থন করে স্বামীজিকে আগে দেশভক্ত ও পরে ভবিষ্যদদ্রষ্টা বলে সম্বোধন করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'স্বামী বিবেকানন্দ — প্যাট্রিয়ট প্রফেট' গ্রন্থে। এমনকী স্বামী অভেদানন্দও স্বামীজিকে 'প্যাট্রিয়ট সেন্ট' বলে উল্লেখ করেছেন। আমার এই বইয়ে স্বামীজির মাতৃবংশ বা ভুবনেশ্বরীদেবীর বংশ আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়াও লিখিত হয়েছে স্বামীজির পিতৃবংশ বা বিশ্বনাথ দত্তের বংশের কথা।

যুগপুরুষ বিবেকানন্দের মা-বাবার ও বিশেষকরে মায়ের (যাঁকে স্বামীজি এত ভালোবাসতেন) বিশদ পরিচিতি প্রয়োজন। সমস্ত বিশ্বের জানা প্রয়োজন এই অনন্যসাধারণ মূর্তিমতি জননীকে, যিনি প্রকাশ্যে থেকেও চির অবগুণ্ঠিতা হয়ে রয়ে গেছেন। আত্মপ্রচারবিমুখ অভিমানী স্বামীজি নানাভাবে জনসমক্ষে তাঁর মায়ের কথা বলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সে কথা হয়তো আমরা বুঝেও বুঝতে পারিনি।

'ভক্তিযোগ'-এ স্বামীজি এক জায়গায় বলেছেন যে— আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুয়েরই প্রয়োজন। এই দুয়ের মধ্যে হৃদয় শ্রেষ্ঠ, কারণ হৃদয়ের মাধ্যম দিয়েই জীবনের মহান ভাবসমূহের স্ফুরণ ঘটে। হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কের তুলনায় কারো যদি কিছুমাত্র মস্তিষ্ক না থাকে অথচ একটু হৃদয় থাকে তা আমি শত শতবার পছন্দ করি। যার হৃদয় আছে তারই জীবন ও উন্নতি সম্ভব, কিন্তু যার কিছুমাত্র হৃদয় নেই অথচ মস্তিষ্ক আছে, সে শুকিয়ে মারা যায়।

স্বামীজির এতবড়ো উক্তির বিশ্লেষণে আমি যাব না, শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এই বই আমি হৃদয় দিয়ে লিখেছি। কেউ যদি শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে এর খুঁটিনাটির বিচার করেন তাহলে হয়তো কিছু ত্রুটি ধরা পড়বেও বা। কিন্তু হৃদয় প্রসারিত করে স্বামীজির চিরদুখিনি মাতা ও পিতার উপাখ্যানকে যিনি গ্রহণ করবেন, তিনিই উপভোগ করতে পারবেন এই গ্রন্থকে। শুধুমাত্র কিছু তথ্য, সন-তারিখ বা ভাষার জটিলতা ধরে কোনো কিছুকে বিচার করলে, ভুল করা হয়। তার সারতত্ত্ব থেকে যায় ঊহ্য।

এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা বলি। স্বামীজি শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'স্বামী শিষ্য সংবাদে' একজায়গায় স্বামীজির সঙ্গে প্রবীণ সংস্কৃত পণ্ডিতদের বাকবিতণ্ডার কথা আলোচনা করেছেন। সেই তর্কে স্বামীজি তাঁর দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে একবার মাত্র 'অস্থি'র জায়গায় 'স্বস্তি' বলে ফেলায় পণ্ডিতরা তাঁকে তীব্র উপহাস করেন। তিনি এই সামান্য ত্রুটির জন্যও ক্ষমাপ্রার্থী

হয়েছিলেন। পরে পণ্ডিতরা তাঁর অদম্য পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার শাস্ত্রজ্ঞানের কাছে নতিস্বীকার করে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন তিনি শিষ্যকে বলেছিলেন যে পশ্চিম দেশে মূল বিষয়কে ছেড়ে তার সামান্যতম ভাষার ত্রুটি নিয়ে খুঁত কাটাকে অসৌজন্যমূলক আচরণ বলে মনে করা হয়। সভ্যসমাজ মূল ভাবটাকেই প্রাধান্য দেয়, ভাষার দিকে লক্ষ করে না। তিনি আরো বলেছিলেন — 'তোদের দেশে কিন্তু খোসা লইয়াই মারামারি চলছে — ভিতরকার শস্যের কেহ-ই অনুসন্ধান করে না।'

স্বামীজির নতুন বাড়ির নীচের তলার বইয়ের দোকানের এক মহারাজ আমার বইয়ের কথা শুনে আপ্লুত হয়ে বলেছিলেন — 'আহা স্বামীজির মাকে নিয়ে বই লেখা হচ্ছে, সে বই যদি খুব পাতলাও হয় তাও অনেক। স্বামীজি কাকে দিয়ে যে কী কাজ করিয়ে নেন তা উনিই জানেন।' আমারও সেই একই বক্তব্য। এ বই মাতৃভক্ত স্বামীজির ভালো লাগলেই আমি ধন্য হব। সার্থক হবে আমার সব প্রচেষ্টা।